অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্

অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্

সিস্টার নিবেদিতা

অনুবাদক

ডঃ ইন্দ্রজিৎ সরকার

ঃ প্রকাশক ঃ
বৌদ্ধিক বিভাগ
রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, দক্ষিণবঙ্গ
'মাধব স্মৃতি'
২৬, বিধান সরণী কোলকাতা - ৭০০ ০০৬

ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ
'শ্রী গুরুজী সভাগৃহ'
তাঁতীবেড়িয়া, হাওড়া
১৯শে এপ্রিল '০৮

ঃ দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
নিবেদিতা প্রয়াণ শতবর্ষে, ২০১০

ঃ মূল্য ঃ
৫.০০ (পাঁচ টাকা মাত্র)

ঃ মুদ্রক ঃ
মহমায়া প্রেস এণ্ড বাইণ্ডিং
৩০/৬/১ মদন মিত্র লেন
কোলকাতা - ৭০০ ০০৬

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ
তুহিনা প্রকাশনী
১২ সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০ ০৭৩

।। অনুবাদকের অনুভূতি ।।

শ্রী গুরুজীর (মাধবরাও সদাশিবরাও গোলওয়ালকর) জন্মশতবর্ষ সমারোহ উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় জয়ন্ত কুমার রায়চৌধুরীর অনুরোধে সিস্টার নিবেদিতার 'অ্যাগ্রেসিভ্ হিন্দুইজম্' নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি অতি অল্প দিনে বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করি।

প্রতিটি ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, বাচনভঙ্গী আছে, রীতি-নীতি আছে। এক ভাষার গতি-প্রকৃতির সহিত অপর ভাষার গতি-প্রকৃতির সাদৃশ্য নাই। সেজন্যে অনুবাদের মাধ্যমে কখনও মূলের আস্বাদ পাওয়া যায় না। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটে না। তবু যতদূর সম্ভব অনুবাদটি মূলানুগ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রয়োজনে কিছু স্বাধীনতাও গ্রহণ করিতে হইয়াছে।

সিস্টার নিবেদিতার এই গ্রন্থটি অতি ক্ষুদ্র হইলেও অত্যন্ত মূল্যবান ও সারগর্ভ। বীজ ক্ষুদ্র হইলেও মহীরুহ তাহাতেই লুকাইয়া থাকে। ইহার প্রতিটি বাণী ভারতবাসীকে ঐহিক ও পারত্রিক কর্মে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলে, তাহার মনে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত করে। তাই বর্তমান ভারতে গ্রন্থটি প্রত্যেক হিন্দুর অবশ্য পাঠ্য বলিয়া মনে হয়। সক্রিয় হিন্দুধর্ম বলিতে কী বুঝায় ইহাতে তাহার বিস্তারিত বিশ্লেষণ রহিয়াছে।

যাহার অনন্ত উৎসাহ ও অনাবিল প্রেরণা সদা জাগরূক থাকিয়া সংসারের নিত্যনৈমিত্তিক শতকর্মের মধ্যেও অনুবাদ কার্যটি অতিদ্রুত সম্পন্ন করিতে সাহায্য করিয়াছে আমার পরম প্রীতিভাজন সেই কল্যাণীয়া পারমিতা রুদ্রকে ধন্যবাদ দিয়া কুণ্ঠিত না করিয়া পরমেশ্বরের নিকট তাহার সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করি। তাছাড়া এই গ্রন্থ প্রকাশনায় যাঁহারা অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

মহাকবি কালিদাস যদি তাঁহার জগদ্বিখ্যাত নাটক শকুন্তলার মুখবন্ধে এই কথা বলিতে পারেন — 'আ-পরিতোষাদ বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।' তবে এই অনুবাদ গ্রন্থটির সমর্থনে আমি আর কী বলিতে পারি?

সাউথ রামনগর
শুভ দীপাবলী
২১.১০.০৬

ডঃ ইন্দ্রজিৎ সরকার

।। সিস্টার নিবেদিতা ও অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্ ।।

সিস্টার নিবেদিতা ভারতবর্ষকে প্রাণাধিক ভালোবাসিতেন। শয়নে-স্বপনে, অশনে-বসনে তিনি সর্বদা এই দেশের কল্যাণ কামনা করিতেন। ভারতের স্বাধীনতা ছিল তাঁহার ধ্যানজ্ঞান।

নিবেদিতার পূর্বনাম ছিল মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে অক্টোবর আয়ার্ল্যাণ্ডের ডানগ্যানন শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্যামুয়েল ওল্ডহ্যামের ধর্মযাজক ছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে হ্যালিক্যাক্স্ স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করিয়া একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতে থাকেন। এই সময় তাঁহার মাতৃভূমি আয়াল্যাণ্ডের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ও রাশিয়ার বিপ্লব কাহিনী পড়িয়া এবং ক্রপট্কিন্ প্রভৃতি রুশ বিল্পবীদের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের মধ্যে বিপ্লব-চেতনা সঞ্চারিত করিবার জন্য তিনি 'রাস্কিন স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

নিবেদিতার পিতা ছিলেন একজন প্রভাবশালী জননেতা ও ধর্মযাজক। ফলে তাঁহার রক্তে ধর্মজিজ্ঞাসা আজন্ম প্রবাহিত ছিল। নিবেদিতার চরিত্রে দুইটি মূল ধারা আসিয়া মিশিয়াছে — ধর্ম ও বিপ্লব। ধর্মের হাত ধরিয়া বিপ্লবের যজ্ঞবেদীতে তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ধর্মজিজ্ঞাসাই তাঁহাকে স্বামী বিবেকানন্দের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লণ্ডনের এক ঘরোয়া আলোচনায় স্বামীজীর সহিত নিবেদিতার প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। বিবেকানন্দের বাণী তাঁহার হৃদয়ে এমন গভীর প্রভাব বিস্তার করে যে, স্বামীজীর আহ্বানে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তিনি ভারতে আসেন এবং ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ঐ বৎসর ২৫শে মার্চ স্বামীজী স্বয়ং তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা দেন এবং নূতন নামকরণ হয় — 'নিবেদিতা'। স্বামীজীর এই নামকরণ সার্থক হইয়াছিল। নিবেদিতার ন্যায় নিবেদিত প্রাণা মহিলা আজও

বিরল। ভারতবর্ষের সার্বিক উন্নতির জন্য তিনি সত্যই নিজেকে নিবেদন করিয়াছিলেন। ঐ সময় কলিকাতায় মারণব্যাধি প্লেগ দেখা দিলে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীদের লইয়া জনসাধারণের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। 'সেবাই ধর্মের সক্রিয় রূপ' — স্বামীজীর এই বাণী তিনি জীবন দিয়া পালন করিয়াছিলেন। নারী শিক্ষার জন্য স্বামীজীর পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বর্তমানে ইহাই 'রামকৃষ্ণ -সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে খ্যাত।

ধর্ম ও বিপ্লবের দোলাচলচিত্ততায় নিবেদিতা সর্বদাই দোদুল্যমানা ছিলেন। তাই স্বামীজীর মৃত্যুর (৪ঠা জুলাই, ১৯০২ খ্রী.) অব্যবহিত পরেই তিনি রাজনীতির সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়াইয়া পড়েন। ভারতের রাষ্ট্রীয় মুক্তিকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিলেন। বরোদায় অরবিন্দ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎকারের পর বাঙলার বিভিন্নস্থানে যেসব বিপ্লবী সংগঠন ছিল, সেগুলিকে সংঘবদ্ধ করিবার কাজে তিনি অরবিন্দকে অপরিসীম সাহায্য করিয়াছিলেন। বাঙলার বহু বিপ্লবী সন্তান নিবেদিতার নিকট উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসেই প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকিবার জন্য তাঁহাকে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়েন। এককথায়, নিবেদিতার কুটির কুট্টিম সে যুগের মনীষীদিগের পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছিল।

কেবল ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় মুক্তি নহে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এমনকি আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতার উপর নিবেদিতা অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন, ভারতবর্ষ একটি জাতির জননী এবং ভারতবর্ষই একটি জাতির অনন্ত শক্তির প্রকাশ। যে কোনো কলাবিদ্যা, চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতির প্রতি নিবেদিতার অনন্যসাধারণ আকর্ষণ ছিল। এইসব শিল্পকলার মাধ্যমে ভারতের অখণ্ডত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং জাতীয় চেতনা জাগ্রত হইবে — ইহাই ছিল তাঁহার

বিশ্বাস। তাঁহার মতে ভারতীয় কলাবিদ্যার মূলে আধ্যাত্মিকত্বর বীজ নিহিত রহিয়াছে। ভারতীয় কলাবিদ্যার বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকত্ব তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিত। তিনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু প্রমুখ শিল্পীদের মধ্যে অসাধারণ উদ্দীপনার সঞ্চার করেন। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা কেমন হইবে তিনি তাহার একটি নমুনা তৈয়ারী করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার সুদৃঢ় বন্ধুত্ব ছিল। সতীশচন্দ্রের 'ডন-সোসাইটি'-র সহিত তাঁহার নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

সারা বাঙলা তথা সমগ্র ভারতের মনে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা চেতনা ও আধ্যাত্মিকতার অগ্নিবীণা বাজাইয়া দিয়া নিবেদিতা ১৯১১খ্রীঃ অক্টোবর মাসের প্রথম দিকেই আচার্য জগদীশ বসু ও তাঁহার পত্নী অমলা বসুর আমন্ত্রণে বিশ্রাম লাভের জন্য দার্জিলিং-এ 'রায়-ভিলা'-তে বসবাস করিতে যান। সেখানেই কঠিন আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া কয়েকদিনের মধ্যেই ১৩ই অক্টোবর ১৯১১ তাঁহার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। ভারতবাসী এক প্রকৃত বন্ধুকে চিরতরে হারায়।

ভগিনী নিবেদিতা রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সমূহ হইল — 'দ্য ওয়েব অফ্ ইণ্ডিয়ান লাইফ', 'কালী দ্য মাদার', 'ক্রাভেল টেল্স্ অফ্ হিন্দুইজম্', 'রিলিজিয়ন অ্যাণ্ড ধর্ম', 'দ্য মাস্টার অ্যাজ্ আই স হিম', 'শিব অ্যাণ্ড বুদ্ধ', 'নোট্স্ অফ সাম ওয়াণ্ডারিং উইথ স্বামী বিবেকানন্দ', 'হিন্টস্ অফ ন্যাশনাল এডুকেশন ইন ইণ্ডিয়া' এবং 'অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্'।

এই 'অ্যাগ্রেসিভ হিন্দুইজম্' গ্রন্থে তিনি দেখাইয়াছেন যে, নিষ্ক্রিয় হিন্দুত্ববাদ কেমনভাবে সক্রিয় হিন্দুত্ববাদে পরিণত হইতেছে। সক্রিয় হিন্দুত্ববাদ বলিতে তিনি বুঝাইয়াছেন, আত্মরক্ষার গতানুগতিক দুর্বলতার পরিবর্তে আগ্রাসনের আনন্দলাভ করিবার মানসিকতা। হিন্দুধর্মে তাই সক্রিয়তার অর্থ পরিবর্তনশীলতা; নিজের মুক্তির জন্য সাধনা করা নহে। বরং অপরকে রক্ষা করা, আর্ত-আতুর, অত্যাচারিত ও উৎপীড়িতকে সাহস দান করা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার অভয় দান করা। তিনি সক্রিয়তা বলিতে আরও

বুঝাইয়াছেন যে, জীবন সংগ্রামে বিরোধী শক্তির সহিত সংঘর্ষে আপন গুণাবলী বিরোধী শক্তিকে গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিবার ক্ষমতা। এই কার্যে আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হইল, প্রাচীন জ্ঞানকে আধুনিক রূপ দান করা। সেইজন্য ভারতবর্ষের ইতিহাস নূতন করিয়া আমাদের রচনা করিতে হইবে। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া প্রাচীন ভারতবর্ষকে জানিতে হইবে। ইংরাজের লেখা ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে চলিবে না। তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের প্রতিটি প্রাদেশিক ভাষায় মহৎ সাহিত্য রচনা করিতে হইবে, যাহাতে ভারতের অতীত বাণীরূপ লাভ করিয়া মূর্ত হইবে; বর্তমান প্রকাশিত হইবে এবং ভবিষ্যতের আভাস সঞ্চারিত হইবে। সাহিত্যের ন্যায় শিল্পেরও পুনর্জন্ম প্রয়োজন। এখন শিল্পে ইউরোপীয় ধারার যে শোচনীয় অনুকরণ দেখি তা নিতান্তই বৃথা। ভারতবর্ষের কখনও বিদেশী রীতি-নীতির অনুকরণ সম্ভব নয়;তবে বিদেশী রীতি-নীতি সম্পর্কে সে কখনও অজ্ঞ থাকিতে পারিবে না। ভারতের শিল্পী একাধারে কবি ও চিত্রকর হইবেন। বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্পী সৃষ্টি হইবে; যাঁহারা ভারতের প্রাচীন মনীষী ও বীরদের চিত্র এমনভাবে অঙ্কন করিবেন যাহা দেখিয়া আমাদের উত্তরাধিকারীগণের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিবে। তলে তলে ভারতের প্রচুর শক্তি রহিয়াছে এবং ক্ষুধা ও নৈরাশ্যের বাধা সত্ত্বেও হিন্দুরা নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বারে পদার্পণ করিতেছে। নিবেদিতার মতে, হিন্দুরা যে নূতন যুগে পদার্পণ করিতেছে তাহার মূল কারণ, হিন্দু ধর্মের সক্রিয়তা। যেদিন হিন্দুরা আরও সক্রিয় হইয়া উঠিবে, সেদিন মহাভারত রচিত হইবে — ইহাই ছিল নিবেদিতার স্বপ্ন। সুতরাং আমাদের একমাত্র কাজ হইল আরও সক্রিয় হইয়া ওঠা।

ডঃ ইন্দ্রজিৎ সরকার

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ

।। ভিত্তি ।।

'প্রকৃত হিন্দুধর্ম মানুষকে কর্মযোগী করিয়া তোলে, কল্পনাবিলাসী নহে।"

— ডঃ জগদীশ চন্দ্র বসু

আধুনিক যুগের অত্যন্ত মূল্যবান সাধারণ ধারণাসমূহের অন্যতম ধারণাটি ফরাসী বিপ্লবের সময় সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই ধারণাটি হইল — জাতি অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তিসত্তা বিকশিত হয়। অর্থাৎ প্রতিটি সুশিক্ষিত নর-নারী জাতির ইতিহাস অথবা সমগ্র মানবতার মূর্তরূপ হইয়া উঠে।

এই মহৎ ধারণাটি বিংশ শতকে পাশ্চাত্যের শিক্ষকদের গুরুস্বরূপ পেস্তালোৎসির মাধ্যমে এক নূতন শিক্ষা পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট উপাদান রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল। তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন— মানুষকে কোনো আশা দিলে তাহা আধুনিক, উদার, মনস্তত্ত্ব সম্পন্ন এক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে দিতে হইবে;যাহার ভিত্তি স্থাপিত হইবে মানুষের ঐতিহাসিক বিকাশ অনুযায়ী মানসিক নিয়ম সংক্রান্ত জ্ঞানের উপর।

ফরাসী বিপ্লবের পর তরুণ দেশপ্রেমিক ছাত্র পেস্তালোৎসি এই মহান ধারণাটি প্রতিষ্ঠার জন্য সুইজারল্যাণ্ডে যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন আজ ভারতবর্ষের কোনো এক দেশপ্রেমিক ছাত্রকে তাহার তুলনায় অনেক বেশি সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। অথচ অভ্যন্তরীণ দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, দুইটি সমস্যাই সমান। তাহা হইল, মানব জমিনকে নব-নব চিন্তার ফসলের জন্য উপযুক্ত করিয়া তোলা এবং তাহার সহিত নিত্যন্ত বাহ্যিক সাংস্কৃতিক কুফলকে এড়াইয়া চলা। যে জমিতে আমের ন্যায় ফল জন্মায় সেখানে শাকসব্জী

চাষ বাতুলতা মাত্র। শুধু তাহাই নহে, বেদ- বেদান্তের দেশে কেবল ইউরোপীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুকরণ মারাত্মক অপরাধ।

অথচ ইহাই ভারতীয় সংস্কৃতির বর্তমান অবস্থা এবং যতদিন না ভারতীয় মন স্বেচ্ছায় ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিবে, ততদিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলিতে থাকিবে। এই ঐতিহাসিকদৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করিতে হইলে নিজেদের নূতন পরিবেশে অভ্যস্ত করিতে হইবে। ভারতীয় সমাজে এতদিন যে সকল বস্তু সংমিশ্রিত অবস্থায় ছিল বর্তমানে সেগুলি স্পষ্ট হইয়া পৃথকরূপ ধারণ করিতেছে। এতদিন যাহা সহজাত প্রবণতা ছিল, বর্তমানে তাহা এমন একটি লক্ষ্যরূপে প্রতিভাত হইতেছে যে, সেই লক্ষ্য নির্দিষ্টরূপ লাভ করিতেও পারে। প্রাচীনকালে হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় আচার-আচরণে বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না; পার্থক্য ছিল কেবল দার্শনিক ক্ষেত্রে। তাই বাস্তবে তাহাদের মধ্যে ব্যবধানও বিস্তর ছিল না। মোটামুটিভাবে ধরিয়া লওয়া হইত, ধর্মীয় কারণেই আমরা বিশেষ রীতি অনুযায়ী আহার করি, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করি এবং বিশুদ্ধ তার নিয়মাবলী মানিয়া চলি।

অকস্মাৎ আধুনিক যুগের আগমনে এই সব বিষয়ের উপর তুলনা, সামঞ্জস্য এবং আপেক্ষিকতার আলোকপাত হওয়ায় দেখা যাইতেছে যে, প্রথা অনুযায়ী জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া ধর্মীয় গুণাবলীর কোনো উন্নতি সাধন করিতে পারিতেছি না; কেবল পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্র একটি আদর্শকে অনুসরণ করিয়া চলিতেছি মাত্র। আর যে আদর্শ সমস্ত রুচিশীল মার্জিত মানবজীবনের স্বপ্ন যাহা আমাদের এযাবৎ অনুসৃত রীতি-নীতি ব্যতীত অন্য পথেও অর্জন করা যায়। লক্ষ্যকে এত স্পষ্টভাবে দেখিবার ফলে আমরা বিভিন্ন পদ্ধ তি সমূহ বিশ্লেষণ ও তুলনা করিবার সুযোগ পাই এবং অন্যের গুণাবলী গ্রহণ করিয়া দোষসমূহ বর্জন করিতে পারি। সর্বোপরি সামাজিক ভাবধারা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সক্রিয় ব্যবধান রাখিবার কৌশলটিও দেখিতে পাই এবং তখনই কেবল সক্রিয়-হিন্দুধর্ম সম্পর্কে আমাদের আলাপ-আলোচনা করা সম্ভব হইয়া ওঠে।

আধুনিক ভারতবর্ষে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে সক্রিয়তাই প্রধান লক্ষ্য হইবে।

সক্রিয়তা বলিতে, সক্রিয়তার চিন্তা ও আদর্শকে বুঝিতে হইবে। নিষ্ক্রিয়তার পরিবর্তে সক্রিয়তা, দুর্বলতার পরিবর্তে সবলতা এবং আত্মরক্ষার গতানুগতিক দুর্বলতার পরিবর্তে আগ্রাসনের আনন্দ লাভ করিবার মানসিকতাই হইল বিপ্লব। অদূর ভবিষ্যতে এইরূপ পরিবর্তনের সূত্রপাত আমাদের নিকট অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

কিন্তু প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। মানুষের চরিত্র গঠনই সব ধর্মমতের মূল লক্ষ্য। সমস্ত তাত্ত্বিক মতবাদই ব্যক্তিগত অভ্যাসের মাধ্যমে চরিত্র গঠন করিয়া তুলিতে চায়। কিন্তু তাহাদের মূল উদ্দেশ্য হইল চরিত্র সৃষ্টি করা, কোনো অনুশীলন বা অভ্যাসের দ্বারা চরিত্র গঠন করা নহে। হিন্দু ধর্মের সূক্ষ্ম বাচবিচারের তুলনায় তাহার আদর্শগুলি যে এখনো গর্ব করিবার ন্যায় রহিয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। একথা সত্য যে, ভারতবর্ষই পৃথিবীতে একমাত্র দেশ, যেখানে কপর্দকহীন ভিক্ষুক সামাজিক মর্যাদায় মহারাজকেও অতিক্রম করিয়া যায়। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও আশ্চর্যজনক সত্য হইল, এই দেশে জনক একজন আদর্শ রাজা হইতে পারেন, আবার শুকদেব হইতে পারেন একজন সামান্য ভিক্ষুক।

সুতরাং এইবার চরিত্র পরিবর্তনে অনুশীলনের মূল্য কতটুকু তাহার তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, ভারতবর্ষে সমাজ-ই মানুষকে সমস্ত জীবন ব্যাপী লক্ষ্য করে। সে তাহার স্নান-পান, পূজা-অর্চনা, আহার-বিহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি স্টাইল-ফ্যাশন লইয়াও সমালোচনা করিতে প্রস্তুত। কিন্তু বিবাহ বা শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সামাজিক নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে সেই রীতি-নীতির পরিবর্তন সাধনের প্রচেষ্টা এদেশের জনসাধারণের নিকট শুধু যে স্বার্থপরতা তাহা নহে; সম্পূর্ণরূপে ধর্মবিরোধীও বটে। ফলে মানুষ যতই গ্রাম ছাড়িয়া শহরে আসিতেছে ততই ব্যক্তি মানুষের বিরুদ্ধে এই ধরনের সমালোচনা প্রবল হইয়া উঠিতেছে। কারণ যে ব্যক্তি গ্রামে ক্ষুদ্র একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশিষ্টতা অর্জনের সাহস রাখে, সে শহরের বৃহত্তর ক্ষেত্রেও সেই বিশিষ্টতা অর্জন করিতে চাহিবেই। তাই শহরের জনসমষ্টিতে ব্যক্তির

দুর্বলতা ও ত্রুটি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে এবং নীচ-মিথ্যা সমালোচনা দ্রুত গুরুত্ব পাইতে থাকে।

কিন্তু যে সম্প্রদায়ে উৎসাহের সহিত সক্রিয় লক্ষ্য ও আদর্শ অনুসৃত হয়, সেই ভারতীয় সমাজে ব্যক্তিকে কঠোরভাবে ব্যক্তিগত শুচিতার মান বজায় রাখিতে হয়। তবে যে জনসাধারণ প্রয়োজনে নরহত্যা করিবার ন্যায় শক্তি ধারণ করে, সে এইসব তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় লইয়া চিন্তা করে না। কৌশল শিক্ষার সূচনা শৈশবে খেলাঘরে মায়ের নিকট ঘটিয়া থাকে। শিক্ষার এই প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করিয়া আসিবার পর মানুষ তাহার মাত্রা হারাইয়া ফেলিবে তাহা আশা করা যায় না। কিন্তু যদি তাহা ঘটে, তবে তাহার অস্তিত্ব উপেক্ষা করিয়া কিভাবে তাহাকে শাস্তি দিতে হয়, সমাজ তাহা ভালোভাবেই জানে। অপরদিকে, ব্যক্তি ও সমাজ দুইজনেরই আরো এত কাজ রহিয়াছে যে, তাহাদের নিজস্ব গর্বের বিষয়ে সময় নষ্ট করা সম্ভব নহে। কারণ সেখানে এখন সম্পূর্ণ নূতন আদর্শ দেখা দিয়াছে। পাশ্চাত্যে শিশু খেলাঘরের পাঠ চুকাইয়া দিয়া বাহিরে আসিলেই তাহার অভিভাবকগণ শিশুটির মধ্যে শম, দম, সমর্পণ, আনুগত্য ইত্যাদি গুণাবলী জাগ্রত করিবার পরিবর্তে শক্তি, উদ্যম, দায়িত্ববোধ এবং প্রতিবাদ ক্ষমতা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। উগ্রভাব ও ইচ্ছাশক্তি পাশ্চাত্যের শিক্ষক ও অভিভাবক মহলে অত্যন্ত মূল্য লাভ করিয়া থাকে। তাঁহাদের মতে, এই সকল গুণাবলী নৈর্ব্যক্তিক উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রিত করা হইলেও কোনোভাবে দমন বা বিনষ্ট করা চলে না। তাই পাশ্চাত্যদেশে খেলার মাঠেই লড়াইকে উৎসাহ দেওয়া হয়, কারণ সেখানে ন্যায়সঙ্গত প্রতিযোগিতাই একমাত্র উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্যবাসীরা মনে করেন, দৈহিক পরীক্ষায় কোনো প্রতিযোগীকে বাধা দানের অর্থ হইল, তাহার সাহস ও আন্তরিকতা ক্ষুণ্ণ করা। কিন্তু সে যদি আপনার চেয়ে অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে আঘাত করে, তবে সহধর্মীদের নিকট আর শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারিবে না।

তাই বলিতেছিলাম, বহু শতাব্দী যাবৎ এশিয়া ভূখণ্ডে যে সামাজিক বিবর্তন ঘটিয়াছে, পাশ্চাত্যে তাহা ঘটে প্রধানতঃ শিশুর দশ বৎসর বয়সের মধ্যে, তাহারপর

সে বীরত্ব দেখাইবার পর্যায়ে উন্নীত হয়। অনেকে মনে করেন যে, বিষ্ণুর দশ অবতার হইল একটি পরিপূর্ণ জীবনের প্রতীক। যদি বিষয়টি সত্য হয়, তবে একথা বলিতেই হইবে যে, ভারতবর্ষও আপনাকে এই শিক্ষাদান হইতে বঞ্চিত করে নাই। কারণ, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ অবতারের স্তর নিরাপদে অতিক্রম করিবার পর শিশু 'বামন-অবতারে' অর্থাৎ ক্ষুদ্র-মানবে পরিণত হয়। তারপর বুদ্ধ অবতারে উন্নীত হইবার পূর্বে তাহাকে দুইবার ক্ষত্রিয় রূপ লাভ করিতে হয়। সুতরাং ব্যক্তির বিকাশ যে জাতি অনুসারে ঘটিয়া থাকে, এখানেই সেই আধুনিক মতবাদটির সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। 'কল্কি' অবতারের কল্পনা কি এমন হইতে পারে না যে, ইহা একটি মহত্তর বিবর্তনের ভবিষ্যৎ বাণী;এবং যাহার মধ্যে বুদ্ধত্বই পুনরায় একদিন প্রেম ও করুণার সামগ্রিক প্রকাশ ঘটাইয়া প্রত্যেক ব্যক্তিকে সক্রিয় আদর্শ জয় করিবার দীক্ষা দান করিবে।

ধরা যাক, আমরা হিন্দুধর্মকে আর হিন্দু রীতি-নীতির সংরক্ষক মনে না করিয়া হিন্দু চরিত্রের স্রষ্টারূপে মনে করিতেছি। এই ধারণার ফলে নানাদিকে যে কত আমূল পরিবর্তন ঘটিতে পারে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়, তখন আমাদের সামাজিক ও ধর্মীয় চেতনায় হস্তক্ষেপের কথা চিন্তা করিলে আর ঈর্ষা কিংবা ভয় থাকে না। যেহেতু হস্তক্ষেপের চিন্তাই তখন আর থাকে না;কারণ তখন আমাদের কর্তব্য আত্মরক্ষা নহে, অন্যদের পরিবর্তিত করা। তাই আমরা আমাদের যাহা কিছু ছিল, সেগুলির প্রত্যেকটিকেই রক্ষা করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। শুধু তাহা নহে, যাহা ছিল না, তাহাকেও অর্জন করিব। এমনকি, আমাদের সম্পর্কে অন্যান্য লোকের দৃষ্টিভঙ্গী কেমন, তাহা নহে; বরং আমরা তাহাদের সম্পর্কে কিরূপ চিন্তাভাবনা করিতেছি তাহাই এখন বিচার্য বিষয় হইয়া উঠিতেছে। আমরা আমাদের ঐতিহ্য কতটা রক্ষা করিতে পারিয়াছি, সেটি বড় কথা নহে;বড় কথা হইল, সেই ঐতিহ্য আমরা কতখানি আয়ত্ত করিতে পারিয়াছি। এখন হারিয়া গেলে চলিবে না, কারণ যুদ্ধকে সুদূরতম সীমান্ত পার করিয়া লইয়া যাইবার জন্য আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। এখন আমরা আর সমর্পণের কথা চিন্তা করিতেছি না। কারণ যে সুদূর জয় অর্জন করা হইবে, সংগ্রাম হইল তাহার-ই প্রথম পদক্ষেপ।

হিন্দুধর্মের ন্যায় পৃথিবীর আর কোনো ধর্ম এমন প্রগতিশীল পরিবর্তন করিতে সমর্থ নহে। নাগার্জুন ও বুদ্ধ ঘোষের নিকট 'বহু' ছিল সত্য, 'এক' ছিল মিথ্যা। আচার্য শঙ্করের নিকট আবার এক ছিল সত্য, বহু ছিল মিথ্যা। কিন্তু শ্রী রামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নিকট উভয়ই ছিল সত্য;কেবল মানব চেতনায় তাহাদের অনুভূতি ছিল ভিন্ন। ইহার অর্থ কি আমরা অনুধাবন করিতে পারিয়াছি? ইহার অর্থ হইল — নিজে মুক্তি লাভ করা অপেক্ষা অপরকে রক্ষা করা অনেক মহৎ কাজ। তাছাড়া, মুক্তির তৃষ্ণা জয় করিলেই মুক্তিলাভ করা যায়। মুক্তির সন্ধান সন্ন্যাসের উচ্চতম পর্যায়। মোট কথা, হিন্দুধর্ম সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, কল্কি অবতারের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে। যাহা কিছু মহৎ, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু শ্রমসাধ্য এবং যাহা কিছু বীরত্বব্যঞ্জক তাহাকে সে আহ্বান করিয়াছে; এমনই এক যুদ্ধক্ষেত্রে আহ্বান করিয়াছে, যেখান হইতে প্রত্যাবর্তনের শৃঙ্গরব আর কখনও শোনা যাইবে না।

*****

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

।। আমাদের কর্তব্য কর্ম ।।

'ক্ষমা যদি দুর্বল ও নিষ্ক্রিয় হয়, তবে তাহা মঙ্গলজনক হয় না; তদপেক্ষা যুদ্ধ অনেক ভালো। যখন তুমি অসংখ্য দেবদূতকে জয় করিতে পারিবে, তখন ক্ষমা করিও।' — স্বামী বিবেকানন্দ

কোনো পুরাতন চিন্তাধারা হইতে নূতন চিন্তাধারায় পদার্পণ করিবার সময়, কিম্বা কয়েক শতাব্দীর শ্রদ্ধাযুক্ত চিন্তাধারা হইতে নবীন ও আধুনিক চিন্তাধারা গ্রহণের কালে, অর্থাৎ এমন একটি সঙ্কটময় মুহূর্তে ভারতবর্ষে যদি দুই একটি প্রজন্মে জ্ঞান-বুদ্ধির বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, তাহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। বরং সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে তাহার দ্রুততা দেখিয়াই বিস্মিত হইতে হয়। মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে নূতন ও অচিন্ত্যপূর্ব একটি ভাষা গ্রহণ করিয়া আদর্শ সংস্কৃতির প্রত্যেক স্তরে পরিবর্তন সাধন করা সহজ কথা নহে। কোথাও ইহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। এই প্রসঙ্গে জাপানের উদাহরণ দেওয়া নিছক বাতুলতা ব্যতীত আর কিছু নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানের সমস্যার সহিত ভারতের সমস্যার তুলনা করা চলে না। কারণ জাপানীরা একটি ক্ষুদ্র ঘনসন্নিবদ্ধ জাতি, যাহার সকলে একই উৎস হইতে সঞ্জাত, একটি ক্ষুদ্র দ্বীপভূমির অধিবাসী, সর্বোপরি দ্বীপের বিচ্ছিন্নতাবোধে প্রবলভাবে আক্রান্ত;তাহারা যেদিকে ইচ্ছা সেইদিকে যাইতে পারে। পক্ষান্তরে বিশাল বিচিত্র ভারতবর্ষে তাহা অসম্ভব। ভারতবর্ষে আজ যাহারা সাবলীলভাবে ইংরাজি বলিতে পারেন, তাহাদের সংখ্যা জাপানের সমগ্র লোক সংখ্যার দুই-তিন গুণ বেশি। তদুপরি, বাধাদানের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইংরাজির জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবেই।

এখন সমস্যা হইল যে, ভারতবর্ষের জনগণ প্রাচীন সংস্কৃতির ন্যায় নবীন

সংস্কৃতির প্রতিও উদাসীন। যে দেশে হাজার-হাজার বৎসর ব্যাপী আত্মার একত্মের ধারণা ছিল মানুষের উচ্চ চিন্তার ও আদর্শ জীবনের ধ্যান জ্ঞান, সেখানে দেশের সমস্ত উদ্যমকে অকস্মাৎ সক্রিয়তা ও পারস্পরিক সহযোগিতার দিকে চালিত করা সহজ কথা নহে। তলে তলে ভারতবর্ষের প্রচুর পরিমাণ শক্তি রহিয়াছে এবং ক্ষুধা ও নৈরাশ্যের বাধা সত্ত্বেও ভারতের মানুষ নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বারে পদার্পণ করিতে চলিয়াছে। ভাঁটার জল অন্তিম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, এইবার অদৃষ্টের প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইবে। এইরূপ ঘটনা ঘটিবার কারণ হইল, বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে ভারতীয় জনগণ তাহাদের অতীত ইতিহাস সংক্ষেপে পর্যবেক্ষণ করিয়া নিজেদের প্রকৃত অবস্থা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে।

ভারতে একটি কথা প্রচলিত আছে, মায়ার রহস্য ভেদ করিতে পারিলে মায়া আর থাকে না। কিন্তু খুব কম লোকেই এই কথাটির তাৎপর্য বুঝিতে পারে। যে সকল বাধা বিপত্তি এখনও আমাদের বিভ্রান্ত করিতে পারিতেছে না, তাহারা অবশ্যই একদিন পরাজিত হইবে। যে অশুভ শক্তি আমাদের চিন্তার বিষয় হইয়া উঠিয়াছিল তাহা এখন দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। পরাজয়কে সঠিকভাবে পরিমাপ করিতে পারিলে তাহা অবশ্যই পরিবর্তিত হইবে। যখন কোনো একটি জাতি, জাতি হিসাবে উচ্চ-নীচ সকল পরিস্থিতিকেই সরল অথচ সুদৃঢ়রূপে উপলব্ধি করিয়া ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তাহাদের সকল সংশয় এবং সকল মোহ দূর হইয়া যায়;যাহার ফলে ঘটনা সমূহ স্বাভাবিকভাবেই গতিসম্পন্ন হইয়া উঠে। বিবেক হইল শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ। আর আধ্যাত্মিকতাই একমাত্র অপ্রতিরোধ্য শক্তি। অগ্নি যেমন তাহার লেলিহান শিখা বিস্তার করিয়া অরণ্য গ্রাস করিয়া চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়, তেমনই মানসিক শক্তিও সমগ্র জাতিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে।

সমগ্র বিশ্বের আধুনিক চেতনাকে সম্পূর্ণরূপে আত্তীকরণ করাই ছিল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতীয় জনগণের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তখন হইতেই মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। পৃথ্বীরাজ, শাহজাহান, অশোক,

আকবর সকলেই একত্রে বিস্মৃতির অতল তলে তলাইয়া গিয়াছেন। শুধু তাঁহারা যে দেশকে ভালো বাসিয়াছিলেন, যে জনতাকে পরিচালনা করিয়াছিলেন তাহারাই নূতন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য, নূতন পরিবেশের সহিত মানাইয়া লইবার শক্তিকে গ্রহণ বা বর্জন করিবার জন্য রহিয়া গিয়াছেন। গঙ্গা ও যমুনার মধ্যে যেমন পার্থক্য, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মধ্যেও তেমনই পার্থক্য সৃষ্টি হইয়াছে। তবে ইহাও সত্য যে, ভাগীরথীর অপ্রতিরোধ্য অজেয় স্রোতোধারার ন্যায় এই দুই যুগ হইতে সঞ্জাত নবীন ভারতবর্ষ অবশ্যই অজেয় হইবে।

যুগান্তরের চাপে জাতীয় মানস এখনও পর্যন্ত তাহার সমস্যাদীর্ণ পরিস্থিতিটি সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। বর্তমানে ধীরে ধীরে সে এই প্রাথমিক স্তরটি অতিক্রম করিতেছে। ভারতীয় মানস আর অন্ধ মূর্ছায় আবদ্ধ নাই। সে এখন নূতন শক্তি লইয়া জাগিয়া উঠিবে এবং অতীত ও বর্তমানকে দেখিবে, যাহাতে তাহারই সাহায্যে ভবিষ্যৎকে নির্ধারণ করিতে পারে।

এই আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা কি? ইহার সংজ্ঞা প্রদান করা হঠকারিতা হইলেও এই বিষয়ে কিছু তথ্য ও ধারণা প্রদান করা কঠিন নহে। সমগ্র পৃথিবীর ভৌগোলিক আবিষ্কার আধুনিক যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আধুনিক-যুগ-মানসের যে বৈশিষ্ট্য তাহাকে অন্যান্য যুগের মানসিকতা হইতে পৃথক করিয়াছে। সেটি হইল, সে পৃথিবী নামক গ্রহের উপরিভাগকে পর্যবেক্ষণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই প্রশংসনীয় আবিষ্কারের আবশ্যিক কারণ হইল, বাষ্পচালিত রেলইঞ্জিন এবং জাহাজ আবিষ্কার। ইহার ফলে, বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ হইতে ব্যক্তিগত ও পৌরাণিক সমতার শক্তি দেখা দিয়াছে এবং বিশেষ সমস্যার সহিত যুক্ত স্থানীয় সংস্কারের সব উপাদানকে মোটামুটি ইচ্ছানুযায়ী পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা, তাহা হইতে আবার জন্মিয়াছে আধুনিক বিজ্ঞানের আদর্শ, আধুনিক সংস্কৃতির আদর্শ এবং ঘটনা বৈচিত্র্যের মধ্যে যে মৌলিক সত্যটি লুকাইয়া রহিয়াছে তাহাকে আবিষ্কার করিবার প্রচেষ্টা।

এইভাবে ভৌগোলিক আবিষ্কারকে কেন্দ্র করিয়া বিশ্বের বৌদ্ধিক ও

আধ্যাত্মিক আবিষ্কার ঘটিয়াছ এবং সাংস্কৃতিক জগতে এক নূতন যুগের দিগন্ত উন্মোচিত হইয়াছে। তাই এখন আর কোনো নূতন বস্তুকে কেবল জানিলেই চলে না; প্রকৃতির অন্যান্য বস্তুর মধ্যে তাহার স্থান এবং সমগ্র জ্ঞানজগতের সহিত তাহার সম্পর্ক স্থাপন করাও একান্ত প্রয়োজন।

অপরদিকে, যন্ত্রের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত আধুনিকতার পথ প্রদর্শকগণ সাফল্যের জন্য প্রধানতঃ যন্ত্রের নিকট ঋণী। বর্তমান যুগে আমাদের শৃঙ্খলা ও ক্ষমতার মাপকাঠির উদ্ভব এখানেই। একটি বৃহৎ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং তাহার কর্মচারীবৃন্দ হইল জটিল ধরনের মানবিক যন্ত্র মাত্র। প্রাচ্যের লোকেরা ভৃত্যকে ব্যক্তিগত অনুচর মনে করে, আর পাশ্চাত্যের লোকেরা তাহাকে একটি ছদ্মবেশী যন্ত্র ব্যতীত অন্য কিছুই মনে করিতে পারে না। ইহা অপেক্ষা সত্য আর কিছুই হইতে পারে না। প্রাচ্যের মানুষ চিরকাল যাবৎ কৃষিজীবী। তাই তাহারা বীজবপন হইতে ফসল কাটা পর্যন্ত সর্বত্রই বিশৃঙ্খলায় অভ্যস্ত। তাহার জন্য কেহ কখনও বিন্দুমাত্র বিরক্ত হয় না। অপরদিকে পাশ্চাত্যের মানুষের প্রতিটি চিন্তা ও অভ্যাস পরিচালিত হয় যান্ত্রিক নিয়ম, দক্ষতা এবং সম্ভাব্য শ্রেষ্ঠ উপায়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইবার জন্য যন্ত্রবিদদিগের প্রচেষ্টার দ্বারা। তাই ইহারা স্বাভাবিক শৃঙ্খলায় অভ্যস্ত।

যে সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের দ্বারাই শৃঙ্খলা ও সমন্বয়ের দ্বৈত পরীক্ষা সাধিত হয়, সেখানে প্রাদেশিকতা একটি মারাত্মক অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এইখানেই নূতন ও পুরাতন পৃথিবীর পার্থক্য। সেকালে অভিজাত রুচি ছিল শ্রেষ্ঠ, আর কদর্যতা ছিল ভয়ানক অপরাধ।

কিন্তু বর্তমানে প্রাদেশিকতা ব্যাপক বৌদ্ধিক ও সামাজিক ব্যর্থতা সৃষ্টি করিলেও কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই সহজে বিশ্বাত্মবোধ আসিবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবেন না। যে বৃক্ষ মাটিতে দৃঢ়বদ্ধ রহিয়াছে, সেই বৃক্ষই কেবল আমাদের অনিন্দ্যসুন্দর পত্রপুষ্পের সম্ভার উপহার দিতে সক্ষম। অনুরূপভাবে, যে হৃদয় চারিপাশের পরিবেশের চাহিদাকে যথাযথভাবে মিটাইতে পারে, যে ব্যক্তি নাগরিক কর্তব্যের দায়বদ্ধতা চূড়ান্তভাবে পূর্ণ করিতে পারে, সেই হৃদয় মনই

একমাত্র যথার্থ বিশ্বনাগরিক হইয়া উঠিতে পারে। **যে ব্যক্তি যথার্থ জাতীয়তাবাদী, কেবল সেই ব্যক্তিই বিশ্বনাগরিক হইয়া উঠিতে পারে।**

সমগ্র পৃথিবীর সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষ এখন এই বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন। চপল-চটুল চরিত্রের যে যুবকটি কাম্‌শ্চাটকা কিংবা উগাণ্ডার গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়া ইউরোপীয় গণতন্ত্রের অভ্যাস ও আচরণে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং সেই কারণেই নিজেকে স্বজাতির উচ্চস্তরের উপযুক্ত সমালোচক বলিয়া মনে করে, তাহাকে লইয়া সকলেই উপহাস করিয়া থাকে। কেহ তাহার সহিত আলাপ করিতে চাহে না, কারণ যাহাদের সহিত আলাপ করিবার জন্য যে এত গর্বিত, তাহাদের চিন্তাজগতে তাহার দান করিবার মতো কোনো বিষয় আর নাই। ফলতঃ তাহার প্রতিটি কর্মে, প্রতিটি পদক্ষেপে চালিয়াতি ফুটিয়া উঠে।

আবার কাম্‌শ্চাটকা কিংবা উগাণ্ডার স্থানীয় গ্রামীণ সংস্কৃতিকে সে যদি আঁকড়াইয়া ধরে, তবে তাহা অনেক বেশি বলিষ্ঠ ও আত্মসম্মানের বিষয় হইলেও নিতান্তই অবাস্তব হইয়া উঠিবে। তবু রুচিহীন হওয়া অপেক্ষা প্রাদেশিক হওয়া অনেক ভালো; যেহেতু রুচিহীনতা সম্পর্কে মানুষের দীর্ঘদিনের ভয়ভীতি রহিয়াছে। কিন্তু এতদুভয়ের কোনো একটির দ্বারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য আসে না। আমাদের নিকট যুগের দাবী হইল এই যে, আমাদের মাধ্যমে সমগ্র অতীত যুগটিই বিশ্বজীবনের অঙ্গ হইয়া উঠিবে। ইহাকেই জাতীয় ভাবধারার রূপায়ণ বলা হয়; তবুও সর্বত্র ইহাকে আন্তর্জাতিক ভাবধারা রূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। দানের শক্তি অধিকাংশ লাভ করিতে হইলে যে কোনো সংস্কার হইতে আমাদের বন্ধনমুক্তি ঘটাইতে হইবে। কিন্তু বস্তুর ধর্মেই এই বিষয়টি অনিবার্যভাবে রহিয়া গিয়াছ যে, নীচ অথবা স্বার্থপর উদ্দেশ্য লইয়া কোনো সংস্কার বিসর্জন দিলে শিক্ষিত মানুষরাও তাহা মানিয়া লইবেন না।

সুতরাং চিন্তায় ও আচরণে আন্তর্জাতিকতা লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। নিজের জাতীয়তাকে পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারিলে বিশ্বজাতীয়তাবাদ লাভ করা যায়। কারণ, বিশ্বচিন্তার সহিত স্থানীয় চিন্তা যুক্ত করিলেই আন্তর্জাতিকতা

পাওয়া যায়। সকলেই জানেন যে, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিতে তথ্য অপেক্ষা সহানুভূতিই অধিক পরিমাণে থাকে। সুতরাং সমগ্র মানবতাবোধের চর্চাই আধুনিক শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ; যাহা কেবল ভৌগোলিক জ্ঞানের দ্বারা লাভ করা যায় না। যদিও পৃথিবীর ঐক্য মানবমনকে অনেকাংশে উদার করিয়াছে, তাই আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, মানবচরিত্র স্বীকৃত অভিজ্ঞতারই ফসল মাত্র। অর্থাৎ তাহার ইতিহাস তাহার মুখমণ্ডলেই লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে একথাটি যেমন সত্য, তেমনই সত্য দেশের ক্ষেত্রেও। কোনো দেশের নৈসর্গিক সৌন্দর্যই সে দেশের লোকের আশা-আকাঙক্ষার উৎসস্থল। আর সেই আশা-আকাঙক্ষা হইতে বুঝিতে পারি, তাঁহারা কোন ঐতিহ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাই আধুনিক চেতনায় ভূগোলের ন্যায় ইতিহাসও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। যে সত্যকে আমরা উন্মুক্ত এবং গতিশীলরূপে দেখিতে চাই, এটি হইল তাহার দ্বিতীয় পর্যায়।

আমাদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ববর্তী সমস্ত ধ্যানধারণাকে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছে। ফলে এখন আর কুকুরকে কুকুর, গরুকে গরু হিসাবে দেখিয়া আমরা আনন্দ লাভ করি না; তাহাদের মধ্যে যোগসূত্র ও বিকাশের কথা জানিতে চাই। ইহাই আমাদের জ্ঞানের নূতনতর পর্যালোচনার ফল। এখন কুকুর ও গরুর পার্থক্যকে আমরা তাহাদের উৎসের সহিত মৌলিক যোগসূত্রের প্রমাণ বলিয়া মনে করি। আমরা পৃথিবীর পাহাড়-পর্বত, পতিত জমি প্রভৃতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে চাই, যাহাতে অশ্বক্ষুর হইতে গোক্ষুর, মৎস্য হইতে সরীসৃপ, এবং এই উভয় প্রজাতি হইতে পাখির উৎপত্তির ব্যাখ্যাসূত্র পাইতে পারি।

শিল্প-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাই যে, এখানে আমাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি তুলনামূলক স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। বাগদাদের ইতিহাস নিরীক্ষণ করিলে আমরা মূরযুগের স্পেনের ইতিহাস বুঝিতে পারিব। অনুরূপভাবে জার্মানীর অরণ্যে ফ্রান্সের বীরত্বের উদ্ভব না দেখিলে তাহার গতিপথ বুঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আমাদের ঐক্যচিন্তা জীবন্ত ও পরিবর্তনশীল হইয়া উঠিতেছে বলিয়া সমগ্র জগতের গতি ও সংঘর্ষের একটি চিত্র দেখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অথচ সর্বাপেক্ষা মার্জিত রুচিবান মানসিকতাও আপন অজ্ঞতা দ্বারা সীমাবদ্ধ। 'চীন' কথাটি শুনিলেই আধুনিক সংস্কৃতিতে অত্যন্ত দুঃখজনক একটি শূন্যতা দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। অথচ ভারতবর্ষ সম্পর্কে কত সাধারণ কথা বলা হইয়াছে, যাহা শুনিলে কোনো রুচিবান শিক্ষিত ভারতবাসী কেবল অনুকম্পার হাসি হাসিবেন। অনুরূপভাবে, মুসলিম দুনিয়া সম্বন্ধেও কতই না ভ্রান্ত ধারণা আমরা পোষণ করিয়া থাকি! কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, সংস্কৃতির জগৎ রাজনৈতিক দুর্নীতির দ্বারা কলঙ্কিত নহে। কারণ জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে জাতি সংস্কারের স্থান নাই। তাই আধুনিক চিন্তাধারায় যে স্থান প্রাচ্যদেশের ব্যাখ্যা দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়া উচিত, সেখানে রাজনীতির তুল্য নীরবতা কেন দেখা দিবে?

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ইহার কারণ অনুসন্ধান করা অত্যন্ত সহজ। পৃথিবীতে একমাত্র ভারতীয়রাই আপন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাহার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে কোনো ভূখণ্ড দখল করে নাই। বরং আধুনিক কালেও সে যাহা লাভ করিয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়াছে;প্রাপ্ত বস্তুর নবীনতা ও বৈচিত্র্যে অভিভূত হইয়াছে। বিগত দুই প্রজন্ম ব্যাপী ভারতবাসীগণ যেন স্বপ্নে বিচরণ করিতেছে;তাহার পৌরুষ নাই, বলিষ্ঠ প্রতিক্রিয়া নাই, এমনকি সাধারণ বুদ্ধিও যেন বিলুপ্ত হইয়াছে।

কিন্তু আজ স্বেচ্ছায় সক্রিয়তার নীতি গ্রহণ করিবার পর আমরা এই সকল বিষয় পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছি। জীবন যে সংগ্রাম, এই কথা উপলব্ধি করিয়া বিরোধী শক্তির সহিত সংঘর্ষে আমরা কেবল বিশ্ব সংস্কৃতি হইতে গ্রহণ করিব না, সেখানে কিছু দান করিবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাকিব। সুতরাং আমাদের ভূমিকা সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে;নিষ্ক্রিয় নহে। ভারতের ভারতীয়করণ, জাতীয় ভাবধারার পুনর্গঠন এবং অগ্রগতির পন্থা নির্ধারণ আমাদেরই সুসম্পন্ন করিতে হইবে। অন্য কেহ আমাদের পরিবর্তে এই কাজ করিয়া দিবে না। আমরা কাহারও পরিকল্পনা আর গ্রহণ করিব না;নিজেরাই নিজেদের পরিকল্পনা রচনা করিব। আমরা আর অন্যের নীতি অনুসরণ করিব না;নিজেদের নীতি নিজেরাই রচনা করিব। মাত্র দশ টাকা মাহিনার কেরানিগিরির শিক্ষানবিসিকে আর শিক্ষা

বলিয়া অভিহিত করিব না। এইসব বিষয়কে যথার্থ ও উপযুক্ত স্থানে রাখিতে চাই। কারণ আমরা বুদ্ধি-বিবেচনার দিক দিয়া স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছি। সুতরাং এখন আমাদের কর্তব্যকর্ম নিরূপণ করিতে হইবে।

আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য হইল, প্রাচীন জ্ঞানকে আধুনিক রূপদান করা। পুরাতন শক্তি না থাকিলে নূতন রূপ প্রহসন মাত্র। পুরাতন শক্তির উপযুক্ত প্রকাশ না ঘটাইতে পারিলে তাহাও একই প্রকার কালাতিপাতের মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আধ্যাত্মিক বুদ্ধিগত এমন কোনো দায়িত্ব নাই যাহা আমরা চেষ্টা করিতে পারি না।

আমাদের আবিষ্কারের তুলনায় আদর্শের বিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। জীবন, কর্তব্য ও স্বাধীনতার নব-নব ধারণা, নাগরিকতার নূতন ভাবনাচিন্তা, প্রেম ও বন্ধুত্বের নূতন নূতন প্রকাশ — ইত্যাদি কর্মে জ্বলন্ত উৎসাহ লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া এই সকল বিষয়কে আপন করিয়া লইব।

আমরা ভারতবর্ষের জীবন্ত ইতিহাস রচনা করিব। এখনও পর্যন্ত ইংরাজিতে লিখিত ইতিহাস বস্তুতঃ ওয়ারেণ হেস্টিংসকে দিয়াই আরম্ভ করা হয় এবং কিছু অনিবার্য প্রাথমিক বিষয় পাঠকের মস্তকে অনুপ্রবিষ্ট করানো হইয়া থাকে। অথচ ভারতের ইতিহাস কয়েক হাজার বৎসর ধরিয়া পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই বিস্তীর্ণ যুগের ইতিহাস মনে রাখা কঠিন হইলেও তাহা পরিত্যাগ করা যায় না। পরিত্যাগ করিলে তাহা নিতান্ত শিশুসুলভ আচরণে পরিণত হইবে, এবং তাহা বন্ধ করা একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস এইবার রচিত হইবে। যে ইতিহাস মানবিক ও আবেগপ্রবণ হইবে। তাহাতে থাকিবে ভারতে বসবাসকারী জাতিসমূহের বীরত্ব ও গর্বের কথা। এই কাজ করিতে হইলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের সহিত পুনরায় যোগাযোগ স্থাপন করিতে হইবে। বর্তমানে এই সকল স্থান হইল — কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি। যে সকল বীর-পুরুষগণ প্রাচীনকালে যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিয়াছেন, যে সকল পূর্বপুরুষগণ প্রশস্ত প্রাচীর বেষ্টিত নগর সমূহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যে সকল

পূর্বপুরুষ পণ্ডিতগণ মূল্যবান চিন্তা ও রচনা রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলে তাঁহাদের বংশধরদিগের অদ্ভুতভাবে নির্বীর্য দেখিয়া স্বর্গে বসিয়া হয় কাঁদিতেছেন নয়তো বা হাস্য করিতেছেন। ভারত-ইতিহাসের সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে ন্যূনতম তিন হাজার বৎসরের পূর্বকার ভূপৃষ্ঠের স্তরে স্তরে। সমদ্রতল, নদীর বালুকণা, অরণ্য, বিস্তীর্ণ জলাভূমি সর্বত্র স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে ভারত-ইতিহাসের উপাদান। এবং প্রতিটি যুগের কেন্দ্রে রহিয়াছে কোনো না কোনো নূতন বিষয়। অযোধ্যা, হস্তিনাপুর, ইন্দ্রপ্রস্থ, পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী, দিল্লী, কাঞ্জীভরম্, অমরাবতী — যে জগতে ইহাদের জন্ম, সেই অদৃশ্য জগৎ কোথায় গেল? পূজা ব্যতীত প্রার্থনা হয় না। হে ভারতবাসিগণ, তোমরা এই সকল বস্তু এবং তোমাদের সমগ্র অতীত বিষয়ের পূজায় আত্মসমর্পণ করো। জ্ঞান অর্জনের জন্য সাগ্রহে প্রচেষ্টা করো। ইতিহাস উদ্ধারকার্যের অস্ত্র-শস্ত্র তোমাদের হস্তেই রহিয়াছে। কারণ যে ভাবনা ও ভাষা প্রাচীন যুগের তাৎপর্য উদ্ধারে সাহায্য করিবে সে সকল তোমাদের একান্ত নিজস্ব জিনিস; কোনোটিই বিদেশীর নহে। ভারতের আশা নিহিত রহিয়াছে গভীরতর অনুসন্ধান ও সত্যের কঠোর গবেষণার মধ্যে। নৈরাশ্য নহে, উৎসাহই তাহাকে শক্তি প্রদান করিবে।

প্রতিটি প্রাদেশিক ভাষায় মহৎ সাহিত্য রচনা করিতে হইবে। এই সব সাহিত্য অতীতকে বাণীরূপ দান করিবে, বর্তমানকে প্রকাশ করিবে এবং ভবিষ্যতের আভাস সঞ্চারিত করিবে। ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে। ভারতবর্ষ কখনও বিদেশী রীতি-নীতি, আচার-আচরণ অনুকরণ করিতে পারিবে না। আবার বিদেশী আদর্শ সম্বন্ধে সে অজ্ঞও থাকিতে পারিবে না। তাই তাহাকে অতীতের ইতিহাস সহজ ভাষায় পুনরায় লিখিতে হইবে। জাতীয় প্রার্থনার ন্যায় আসন্ন ভবিষ্যতের প্রকৃত আশা-আকাঙ্ক্ষা সকলের হৃদয় পরিপূর্ণ করিবে। এই রকম মাতৃভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির উপর নারীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা নির্ভর করিতেছে।

সাহিত্যের ন্যায় শিল্পেরও পুনর্জন্মের প্রয়োজন। এখন আমরা ইউরোপীয়

ধারার যে শোচনীয় অনুকরণ দেখি, সেই রকম অনুকরণ নিতান্তই বৃথা। জনগণের নিকট উপস্থিত হইতে হইলে শিল্পের ভাষাই সর্বশ্রেষ্ঠ। একটি গান, একটি ছবি — পোড়া ক্রুশের মতো সকল সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছাইয়া তাহাদের ঐক্যবদ্ধ করিবে। শিল্পকলার নবজন্ম লাভ হইবে, কারণ সে একটি নূতন বিষয়বস্তু লাভ করিয়াছে; যাহার নাম ভারতবর্ষ। আহা! কোনো শিল্পী যদি ব্রোঞ্জের মাধ্যমে তাহার ভাবনাকে জগতের নিকট প্রকাশ করে এবং সেই ভাবনা মূর্ত হইয়া দেখা দিবে দাক্ষিণাত্যের অন্ত্যজ জাতির সৌন্দর্যের প্রতিভূস্বরূপ যে ব্যক্তি মাদ্রাজের সমুদ্র সৈকত দিয়া প্রায় নগ্নদেহে চলিয়াছে তাহারই মাধ্যমে, তাহা হইলে কত সুন্দরই না হইত। কোনো শিল্পী যদি মিলের মতো চিত্র অঙ্কন করিতে পারিত, যাহাতে থাকিত সমুদ্রসৈকতে পূজারতা, ধ্যানমগ্না কোনো এক মহিলার মূর্তি, তাহা হইলে কত সুন্দরই না হইত। কোনো পেন্সিলে যদি ভারতীয় শাড়ীর সৌন্দর্য, গ্রাম ও মন্দিরের শান্ত জীবন, গঙ্গাতীরে মানুষজনের চলাফেরা, শিশুদের খেলাধুলা এবং ঘরে ফেরা গভীগুলির মুখ ও রাখাল বালকদের পরিশ্রমের ছবি তুলিয়া ধরা যায়, তবে কত সুন্দর হইত।

কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় কথা হইল, ভারতবর্ষের নিজের জন্য শিল্পীর প্রয়োজন রহিয়াছে। যে শিল্পী একাধারে কবি ও চিত্রকর হইবেন, তাঁহারা গ্রামের মধ্যে নতুন শিল্পচিন্তা জাগাইয়া তুলিবেন। আমাদের এমন বিশুদ্ধ ভারতীয় শিল্পী চাই, যাঁহারা প্রাচীন যুগের ভীষ্ম ও যুধিষ্ঠির হইতে আরম্ভ করিয়া, আকবর, শেরশাহ, রাণা প্রতাপ, চাঁদ বিবি প্রভৃতি মহান ব্যক্তিত্বগুলিকে এমনভাবে অঙ্কন করিবে, যাহাদের চিত্র দেখিয়াই আমাদের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকিবে। ইহার মাধ্যমে আমরা জাতি হিসাবে আগামী যুগের নূতন কর্তব্য সমূহ অনুভব করিতে চাই। ভারত কেবল পৃথিবীকেই বলিবে না, নিজেকেও বলিবে — শিল্প যখন বাস্তবের রূপে আবৃত হইয়া থাকে, তখন ইহাই তাহার লক্ষ্য ও আদর্শের পবিত্র উৎস হয়।

সুতরাং প্রতি পদে পদে জয় হইবে দ্বিমুখী;একদিকে বিশ্বের জ্ঞান বৃদ্ধি পাইবে,

অন্যদিকে এই ভারত প্রথম তাহার নিজস্ব কথা বলিবে। বর্তমান প্রজন্মের সম্মুখে এই সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে। তাই বর্তমানের সঠিক সংগ্রামের উপর পরবর্তী সংগ্রামের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছে। আমাদের জাতীয় জীবন জাতীয় আক্রমণে পরিণত হইয়াছে। এখনও অবরুদ্ধ নগরের বহির্দিকটি প্রায় অক্ষত। সুতরাং এইবার আঘাত করা যাইতে পারে। হে ভারতের অতীতকালের অধিবাসীগণ, তোমরা কি রাত্রিকালে যুদ্ধক্ষেত্রে ঢালে হেলান দিয়া ঘুমাইতে ভয় পাইতেছ? আধুনিক জগতের সম্পদ অধিকার করিবার জন্য আধ্যাত্মিকতার নামে অগ্রসর হও। ভারতভূমির বীর সৈনিকগণ, তোমরা দুর্গ দখল করিয়া নগরে প্রবেশ কর। কষ্টার্জিত দুর্গের মধ্যে সৈন্য সংস্থাপন করিয়া নজর রাখো কিংবা পরাজয় বরণ করো; যাহাতে তোমরা যে উচ্চস্তরে উপস্থিত হইতে চাহিয়াছিলে অন্যেরা তোমাদের মৃতদেহের উপর দিয়া সেখানে পৌঁছাইতে পারে।

*****

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

।। আদর্শ ।।

'তুমি যাহা হইতে চাহিয়াছিলে, তাহাই হও।'

সক্রিয় বা আক্রমণাত্মক মানসিকতা গ্রহণ করিলে আমাদের নিকট সকল তত্ত্বের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যায়। এখন একমাত্র লক্ষ্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতেছি না। এখন উপায় লক্ষ্য হইয়াছে, আর লক্ষ্য হইয়াছে উপায়। ব্যয়ের হিসাব ও সন্দেহভাব একেবারে চলিয়া গিয়াছে। ক্ষুদ্র-তুচ্ছ আশা-আকাঙক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আমরা এখন মহৎ বস্তুর সন্ধান ও সৃষ্টি করিয়া চলিতেছি। ভারত এখন মহাভারতে পরিণত হইয়াছে। অতীতকাল অপেক্ষা বর্তমানে আত্মত্যাগের সুযোগ অনেক বেশি। আমরা পূর্বপুরুষ অপেক্ষা তাহাদের বংশধরদিগকে মহৎ করিতে চাই।

'কর্ম' কথাটির অর্থ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। কর্ম বলিতে এখন আর ভাগ্য বুঝায় না;সুযোগ বুঝায়। আমি কি অবিচার দেখিতেছি? উৎপীড়নে বাধা দান করিবার অধিকার আমার আছে? সুতরাং আমি নিশ্চয়ই বাধা দিব। যেহেতু একজন নির্ভীক ব্যক্তির যথার্থ ক্রোধের সম্মুখে সমস্ত মায়া বিনষ্ট হইয়া যায়। আমার সম্মুখে অবস্থিত আমার নিস্ক্রিয় ভাগ্যকে আমিই জয় করিব। আমাদের সুন্দর জীবনকে গ্রহণ করিয়া প্রয়োজন বোধে তাহাকে ভাঙিয়া ফেলিবার ক্ষমতাকেই শক্তি বলে। সেই শক্তি আজ আমরা লাভ করিয়াছি। সেই শক্তি দ্বারাই আমরা বিশ্ববিজয় সম্পন্ন করিব। যে ব্যক্তি জয়লাভ করিবার পরেও জয় করিবার মতো কিছু বিষয় আছে ভাবিয়া কখনও পরাজয়ের কথা চিন্তা করে না, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে অপরাজেয়।

আমাদের কামনা-বাসনা মাত্রাতিরিক্ত বাড়িয়া গিয়াছে। সেই বাসনা হইল

দান করিবার বাসনা;লাভ করিবার নহে। হয়তো আমরা জয়লাভ করিতে পারিব না, কিন্তু পশ্চাৎবর্তী লোকদিগের হাতে জয়ের ভার দিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে পারিব। আপনার অপেক্ষা প্রিয় বস্তুর জন্য আমরা জীবনদান করিতে উৎসুক এবং এই আত্মত্যাগই আমাদের সকল কর্মকে উৎসাহে রূপান্তরিত করিবে। আমাদের সমস্ত জীবনই মৃত্যুর অনুসন্ধান হইয়া উঠিবে। যাহারা আমাদের ঘনিষ্ঠ জন, তাহারাই হইবে আমাদের সমস্ত ঝুঁকি ও প্রতিরোধের একমাত্র সঙ্গী। ইহার মধ্যে যে মুক্তি রহিয়াছে, তাহাই আমরা বুঝিতে শিখিব। বুদ্ধ দেব সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার সময় যশোধরাকে ত্যাগ করেন নাই;নিজের সহিত তাহাকেও ত্যাগের মহিমা দান করেন।

কিম্বা ব্রম্মচর্য কেবল সন্ন্যাসীর জন্য নহে;ব্রম্মচর্য কেবল দেহকেন্দ্রিক নহে। কেহ কেহ বলেন, উদ্দেশ্য বিহীন মহৎ কৃচ্ছ্রতাও অর্থহীন। তাহার ফলে কেবল একটি শক্তিই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় মাত্র। তাই ব্রম্মচর্যকেও সক্রিয় হইতে হইবে। ব্রম্মচর্য বলিতে বুঝিব — ইহা জীবনের এক নিরাসক্ত দিক, যাহা মন ও আত্মাকে সক্রিয়ভাবে দেখিয়া থাকে। বিবাহ মূলতঃ মনের বন্ধুত্বই হওয়া উচিত। চিন্তার বিনিময় ও সংগ্রামের সম্বন্ধ সান্ত্বনা অপেক্ষা অনেক বড়। একটিকে বাদ দিয়া অপরটি চলে না। বীরের ব্রম্মচর্যের ফলে বিবাহ মহৎ হইয়া উঠে, যেহেতু সেখানে মূল লক্ষ্য হইল অপরের কল্যাণসাধন করা। যথার্থ ব্রম্মচর্যের সহিত নারীর শিক্ষা জড়িত থাকে, কারণ তখন চিন্তা ও জ্ঞানে সম্পূর্ণ পরিণতির ফলে উজ্জ্বল পবিত্রতা আসে। স্ত্রীও তখন সন্ন্যাসীর ন্যায় ব্রম্মচর্য পালন করিতে থাকেন।

তপস্যার জীবনে অবিরাম শক্তি ও জ্যোতির পুনরুজ্জীবন ঘটে। সরস্বতীর উপাসকের পক্ষে সকল কর্মই সহজ হইয়া যায়। সে তখন সম্মুখে অনায়াসে অগ্রসর হইয়া চলে। প্রতিদিন প্রতি-ক্ষণে তাহার জীবন ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া নৈর্ব্যক্তিক হইয়া উঠে। তাহার আদর্শ জ্বলন্ত অগ্নিশিখাবৎ উর্ধ্বগতি লাভ করে। তখন প্রতি বৃত্তে নূতন লক্ষ্যের সৃষ্টি হয় এবং স্ত্রী স্বামীর আদর্শের অংশ গ্রহণ করে। আর সেই আদর্শকে রক্ষার জন্য প্রয়োজনে স্ত্রী স্বামীর বিরুদ্ধাচরণেও কুণ্ঠাবোধ করে না। স্বামী একা হইয়া পড়িলে হতাশ হইয়া যায় এবং সে সময় স্ত্রী তাহাকে আদর্শের দিকে আগাইয়া দেয়। এই উপলব্ধির মাত্রা

দিয়া সে উভয়ের গৌরবের পরিমাপ করে। তাহার নারীত্ব শাশ্বতসত্যের পূজার ন্যায় গম্ভীর ও কমনীয় হইয়া উঠে। তখন দুইজনেরই কর্ণকুহরে বাজিয়া উঠে 'ইহা নহে — ইহা নহে' - ধ্বনি। আপন সুখকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া দুইজনেই তখন দুইজনের মাধ্যমে পরিপার্শ্বস্থ পৃথিবীকে সুখ দান করিতে চাহে।

'সন্ন্যাসী' কথাটি তাই এখন নূতন অর্থ লাভ করিয়াছে। সেই অর্থ তাহার গৈরিক-বসনে নাই; আছে পরার্থপরতায়। পরার্থপরতার জন্যই সে সন্ন্যাসী। বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন সন্ন্যাসী আছেন, তেমনি সন্ন্যাসী আছেন শিল্পকলায়, জনজীবনে, জনসেবায় এবং অসহায়ের রক্ষা কার্যে। ত্যাগের প্রেরণা মহৎ কিন্তু তদপেক্ষা মহত্তর হইল বীরোচিত জীবনের দৃঢ় আত্মত্যাগ। তাই, সৈনিক ও সন্ন্যাসীর মধ্যে কে মহত্তর তাহা নির্ধারণ করা অনেকসময় মহাপুরুষের পক্ষেও কঠিন হইয়া পড়ে। সন্ন্যাসী সৈনিকের দুঃসাহসিকতার সহিত আপন স্বাধীনতার মিলন ঘটাইয়া থাকেন। জীবন সক্রিয় থাকিলে মহাকালও সেখানে কোনো প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। যৌবনের ন্যায় বার্ধক্যেও সে উঁচু বৃক্ষ হইতে মাটিতে লাফাইয়া পড়িতে প্রস্তুত থাকে। কখনও কখনও দেখা যায় বার্ধক্যেই তাহার অধিকতর প্রস্তুতি রহিয়াছে। কারণ, সময়ের সহিত আধ্যাত্মিক ইচ্ছারও উন্নতি ঘটিয়া থাকে। ব্যক্তিগত আশা-আকাঙক্ষা দিয়া এই উন্নতির পরিমাপ করা যায় না। সমস্ত কিছুর পরীক্ষা হয় চরম উদ্দেশ্য লইয়া; এবং সেটিই হইয়া ওঠে পরম লক্ষ্য। স্বার্থ আর তখন লক্ষ্য থাকে না। কারণ হাত একবার লাঙ্গল ধরিলে তাহাতেই চিরদিনের জন্য অভ্যস্ত হইয়া যায়। তখন আর সেই পথ হইতে ফিরিতে পারে না। কোনো দুঃখই সন্ন্যাসীকে স্পর্শ করিতে পারে না। পরাজয় তাঁহার নিকট একটি সাময়িক অবস্থামাত্র; পরম জয় তাহার অনিবার্য। তাই সন্ন্যাসী সফলতা ও বিফলতায় সমান প্রসন্ন থাকেন।

গুরুর প্রতি আনুগত্যে ভাবধারার আন্তরিক রূপায়ণ এবং সেই রূপায়ণে নূতন পথের অনুসন্ধান দেখা দেয়। সেই সময় হইতে প্রতিটি উপলব্ধিকেই আধ্যাত্মিক সাফল্য বলিয়া মনে হয়। প্রতিটি অনুভূতি শিষ্যদের দান করিতে না পারিলে মনে শান্তি থাকে না। সেই সঙ্গে শিষ্যের মানও উন্নত হইয়া ওঠে। তখন আর অচল পয়সাকে খাঁটি বলিয়া চালানো যাইবে না। আগ্রহীকে সেবা

করিতে হইবে। কারণ উপযুক্ত পরিমাণ সেবা না করিলে সত্য অঙ্কুরিত হইবে না। তাহাকে পূজা করিতে হইবে। কারণ আনুগত্য না থাকিলে পৌরুষ থাকে না। কিন্তু বিন্দুমাত্র কপটতা, বিন্দুমাত্র স্বার্থের চিহ্ন থাকিলে গুরু বুঝিতে পারেন। যদিও তাহাতে জীবনের মত শিষ্যকে ত্যাগ করেন, তবু বোঝেন যে, এরকম শিষ্য থাকা অপেক্ষা না থাকাই শ্রেয়।

ভালবাসা ও ঘৃণা উভয়েরই শক্তি বিশাল। ভালবাসা যখন নৈর্ব্যক্তিক ও বলিষ্ঠ হইয়া ওঠে তখন সে প্রেরণাদাত্রী, তেজস্বী ও প্রাণদায়ী হয়। আবার ঘৃণা বলিতে বোঝায় আপোষকে প্রত্যাখ্যান করা। সে নীচতা ও মিথ্যাচারকে সমূলে উৎপাটিত করে এবং যাহাকিছু আন্তরিক তাহার অন্তরালে ভালবাসা উদ্দেশ্যের একাগ্রতাকে খুঁজিয়া পায়। অহংকার নিজেকে মিথ্যাবাদী ভাবিতে পারে না। মানুষ স্বয়ং কাজ করিবার পূর্বে নীরব থাকে। সে সাহস করিয়া পূর্বপুরুষ ও সহচরদিগের কৃতিত্ব লইয়া গর্ব করে না। তাহার সকল উচ্চাশার সহিত মিশিয়া থাকে গভীর বিনয় এবং সে বুঝিতে পারে অযোগ্য ব্যক্তির মুখে প্রশংসা মানায় না।

জীবনের পরম উদ্দেশ্য হইল, অগ্নির ন্যায় সব কিছুকে আত্মসাৎ করা। লক্ষ্য কেবল লক্ষ্যের জন্যই কাম্য হইয়া উঠে। যে শিবিরাজার সমগ্র মনপ্রাণ ছিল ত্যাগের মধ্যেই সমর্পিত, তাহার ন্যায় দেহের দক্ষিণ অংশকে কেবল কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই শরীরের বাম অংশও কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। মায়ার নামক এক জার্মান রসায়নবিদের নাইট্রোজেন যৌগ আবিষ্কার করিতে গিয়া একটি চোখ ও একটি হাত নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সেই অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার আত্মা আজানু-প্রণতঃ হইয়া জানাইয়াছিল যে, জ্ঞানের সন্ধান অব্যাহত রাখিবার সুযোগ এখনও আছে। এই সব কর্মীর মুখে যখন 'কর্ম' কথাটি উচ্চারিত হয় তখন তাহা অন্যের হৃদয়ে জ্ঞানের রোমাঞ্চ জাগ্রত করে।

যে সন্ন্যাসী অন্যের সেবাকে জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি বজ্রের ন্যায় দৃঢ়, ব্রহ্মচারীর ন্যায় কঠোর, উদারহৃদয় ও পরার্থপর হইবেন। বীরত্বব্যঞ্জক হিন্দুধর্মের সন্তানদের এইরূপ হওয়া উচিত।

*****

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

।। আদর্শের পথে।।

জগতে যতরকমের অজ্ঞতা আছে, তাহার মধ্যে সর্বাধিক হীন এবং সহজ হইল স্বকীয় আদর্শবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা। অনেক সময় আমরা উন্নত হইবার চেষ্টা না করিয়া কেবল আমাদের অতীতকে আরাধনা করিয়া থাকি। প্রথম যৌবনে প্রায় সকল মহান ব্যক্তিই প্রবল শক্তি ও আন্তরিকতা অনুভব করেন। সেই সময়ে তাহাদের জীবন যে ধারণ করিয়াছিল তাহা তাহারা পিছন ফিরিয়া দেখে এবং বাকি জীবন সেই বিশেষ রূপটিকে অন্যদের উপর চাপাইয়া দিবার চেষ্টা করে। আমাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই প্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান লাভ করিয়াছেন।

বর্তমান যুগে স্বকীয় আদর্শবাদ (Self idealism) একটি বিশেষ বিপদস্বরূপ। এই যুগ আদর্শ পুনরুদ্ধারের যুগ। আমাদের উন্নতির সূত্র অন্বেষণ করিতে গিয়া আমরা সর্বদা অতীতের মধ্যে অবগাহন করিতেছি। আমরা আপনাদিগের মানকে উচ্চে তুলিয়া ধরিতেছি, পূর্বপুরুষদিগের প্রশংসা করিতেছি; যেন আত্মপ্রশংসায় উদ্বুদ্ধ হইয়া আমরা আকাশে পৌছাইয়া গিয়াছি। অবশ্য এইসবের উদ্দেশ্য হইল উৎসাহদান করা; অহংকার প্রকাশ করা নহে। কোনো এক খ্যাতনামা বক্তা তাঁহার সম্মুখস্থ শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, 'হে ঋষিগণের সন্তান।' কিন্তু ইহা শুনিয়া কোনো সাধারণ ব্যক্তি যদি মনে করে যে, সে একজন ঋষি, তবে সেটি তাহার তামসিকতার পরিচায়ক হইবে। কিন্তু বক্তা কখনোই এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিতে চাহেন নাই, যাহাতে শ্রোতা নিজেকে ঋষি ভাবেন।

অনুরূপভাবে আমরা যখন বলি যে, যীশুখ্রীষ্ট একই সঙ্গে ইউরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশের প্রতিনিধি, তখন আমরা বলিতে চাই এশিয়ার আদর্শের কথা; রাস্তার কোনো লোকের কথা নহে। এই বিষয়টি অত্যন্ত সাবধানে এবং পরিষ্কারভাবে

চিন্তা করিতে হইবে। বহু লোক ত্রিশ কোটি মানুষের প্রতিভূস্বরূপ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া থাকে যে, তাহারা যীশু, শ্রীচৈতন্য ও তুকারামের পদ্ধতির চর্চা করিবে; এবং এক্ষেত্রে কোনো কিছুই তাহাদিগকে বাধাদান করিতে পারিবে না।

কিছুই বাধা দিতে পারিবে না। আমরা প্রত্যেকেই যীশু বা শ্রীচৈতন্যদেব হইলে সত্যসত্যই কেহ তাহাতে বাধা দান করিতে পারিত না। খ্রীষ্টের প্রচারক বলিয়াছেন — 'যাহারা ভেড়ার লোম কাটে, তাহাদের সামনে যেমন ভেড়াগুলি চুপ করিয়া থাকে, তেমনি তিনিও চুপ করিয়া থাকিবেন।' কিন্তু আমাদের নীরবতা কি এতই বাঙ্ময়? কেবল তামসিক ব্যক্তিরাই এই জাতীয় ভুল-ভ্রান্তি করিয়া থাকেন। খ্রীষ্টের পদ্ধতিতে খ্রীষ্ট ব্যতীত অন্য কেহ সফলতা অর্জন করিতে পারিবেন না। কারণ অন্যের ক্ষেত্রে নীরবতা শুধুই ভীরুতা, তাহা খ্রীষ্টীয় নীরবতা নহে।

তামসিক ব্যক্তি আরও বলিয়া থাকেন, — 'যতক্ষণ না আমি তাঁহার ন্যায় হইয়া উঠিতে পরিতেছি, ততক্ষণ পর্যন্ত জয়ের জন্য অপেক্ষা করিব।' এই কাজ যদি আত্মমগ্নতার দ্বারা সম্ভব হয় তাহা হইলে অতি উত্তম; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তোমরা তাহা পারিবে না। কারণ, যে আপন জয়ের কথা ভুলিতে পারিবে, সেই ব্যক্তিই খ্রীষ্টত্বে উপনীত হইতে পারিবে। বুদ্ধদেবকে বুদ্ধত্ব লাভ করিতে গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যে বহুবার মরিতে হইয়াছিল। আর প্রত্যেকবার তিনি আত্মাকে, জীবনকে, মৃত্যুকে ভুলিয়াছিলেন; অতীতের কথা চিন্তা না করিয়া সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। অবশেষে বিপুল বিশ্বের সাম্রাজ্য জয় করিবার পর সেই নিশ্চয়তা তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যাহার ফলে আরও উচ্চতর স্তরে উঠিয়া তিনি আত্মার করুণার বাহক হইয়াছিলেন।

মায়া-রূপ নদীর উপরে প্রত্যেকের পার হইবার পথ রহিয়াছে। এক একবারে এক একটি পাথরে পা দিয়া আমরা অগ্রসর হইয়া যাই। তখন আমাদের সমগ্র মন-প্রাণ প্রস্তুত থাকে পরবর্তী পদক্ষেপের প্রতি। তবে আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই এমন চরম লক্ষ্যে পৌঁছাইতে পারিবে না। আমাদের জন্য শুধু তাৎক্ষণিক লক্ষ্যই রহিয়াছে। সে লক্ষ্য যাহাই হউক না কেন, তাহার জন্য নিজেকে ভুলিতে হইবে। তবেই সেখানে পৌঁছানো যাইবে। যাহা কাজকে অতিক্রম করিয়া

রহিয়াছে, তাহাকে লাভ করিতে হইলে কাজের মধ্য দিয়াই যাইতে হইবে। পৃথিবীতে এমন বহু কাজ আছে যাহার জন্য মানুষ সব কিছুই দান করিতে প্রস্তুত। যে নিঃশ্রেণি বাহিয়া আমরা মুক্তিতে উপনীত হইতে পারি, আপাতত তাহা দৃশ্যমান নহে। বিভিন্ন আত্মার জন্য বিভিন্ন স্তর রহিয়াছে। সকলের জন্য একই উপদেশ নহে। কেবল সর্বত্র রহিয়াছে একটি মহৎ নিয়ম; ত্যাগ ও অহম্‌কে বিস্মৃতির দ্বারাই মানুষ চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে।

যদি সত্যই 'অহম্'-কে ভুলিতে পার, তাহা হইলে সকলেই তোমার মনে সাড়া জাগাইবে। অপরের কল্যাণের জন্য আমাদের আগ্রহ দেখা দিবে; তখন আমরা আর তত্ত্ব, আদর্শ, পদ্ধতি ও পরিকল্পনা লইয়া তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করিব না। অপরের কল্যাণের জন্য বাঁচিব এবং উন্নতির সংগ্রামে নিজেদের মিশাইয়া দিব। তখন সংগ্রাম, সৈনিক, শত্রু সমস্ত বিষয় একাকার হইয়া যাইবে। আমাদের অধিকার থাকিবে কেবল কর্মে, ফলে নহে।

কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ করিয়াছি বলিলেই তাঁহাকে লাভ করা যায় না। বহু কঠিন পরিশ্রমের পর মানুষ ঈশ্বর লাভ করে। আমরা ঈশ্বরলাভের জন্য পরীক্ষা দিতে আগ্রহী, সক্রিয় সেবার জন্য ব্যাকুল; কিন্তু তাহার অর্থ এই নহে যে, আমরা যোগ্য হইয়া উঠিয়াছি। অবশ্য কামানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমরা যোগ্য হইয়া উঠিতে পারি। সংগ্রামের অগ্নিতে আপনাকে আহুতির ন্যায় সমর্পণ করিয়া দিয়া বিপুল আতঙ্কের মুহূর্তে নির্ভীক থাকিয়া দুর্যোধন এই সুযোগ পাইয়াছিলেন। ইহা ছিল অত্যন্ত বীরোচিত কাজ। ইহা ছিল অত্যন্ত বীরত্বব্যঞ্জক পন্থা। প্রসঙ্গতঃ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন — 'বস্তুর পরিবর্তন ঘটাইলে বস্তুর উন্নতি হয় না, আমাদেরই উন্নতি হয়।'

সুতরাং এই জগৎ হইল আত্মার বিদ্যালয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে মানবতা এমন একটি কাঁচ-বসানো বিশাল ঘর নহে যে, তাহার অভ্যন্তরে একটি চেহারা কোথাও ভালো কোথাও মন্দরূপে বারংবার দেখা যাইবে। জগদীশ্বর আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই নিজেকে চরম ও বিচিত্ররূপে দেখিতে চাহেন। কেবল আদর্শ জীবন হইতে আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহাদের পথ চলিবার নীতি এবং যে

লক্ষ্যের জন্য তাঁহারা পরিশ্রম করিয়াছেন সেই লক্ষ্য বস্তুটিকে। ত্যাগ ! ত্যাগ ! ত্যাগ ! ত্যাগের উন্মত্ততায় অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দাও। তোমার যুগের ধর্ম, তোমার স্থানীয় প্রয়োজনকে উপাদানরূপে গ্রহণ কর। ইহার সাহায্যে আত্মা তাহার মহৎ যাত্রার তরণী তৈয়ারী করিয়া লইবে। একথা ভাবিও না, পূর্বে যাহা ঘটিয়া গিয়াছে তাহাকে হুবহু অনুকরণ করা যায়। পূর্বে যাঁহারা আসিয়াছেন তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কেবল এই আশ্বাসটুকু অর্জন কর যে, তাঁহারা সফল হইলে তুমিও ব্যর্থ হইবে না। তাহা হইলে, যাত্রাকর। আত্মাকে অন্বেষণ করিতে চেষ্টা কর। আর, যাহারা এখনো যাত্রা করে নাই, তোমার যাত্রা যেন তাহাদের যাত্রা পথে উৎসাহের আলোকবর্তিকা রূপে দেখা দেয়।

*****

।। তথ্যাবলী ।।

পেস্তালোৎসি ঃ—

ফরাসী চিন্তাবিদ। ইনি ইউরোপীয় শিক্ষকদের গুরু স্বরূপ ছিলেন। 'জাতি অনুসারে প্রতিটি ব্যক্তিসত্তা বিকশিত হয়'—ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম এই তথ্যটি তিনি প্রচার করেন। এই তত্ত্ব প্রচার করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়।

বুদ্ধদেব ঃ—

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক। হিন্দুদের নিকট ইনি বিষ্ণুর নবম অবতার রূপে পূজিত হন। প্রকৃত নাম গৌতম। পিতা শুদ্ধোদন, মাতা মায়াদেবী। কপিলাবস্তু নগরে, লুম্বিনী উদ্যানে, বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে, শাক্যবংশে আনু. ৫৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ঊনত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে বোধি লাভ করেন। বোধি লাভের পর তিনি ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর ধর্মের মূল কথা হইল—অহিংসা।

জনক ঃ—

মিথিলার ধার্মিক রাজা। সীতার পিতা। যজ্ঞার্থ ভূমিকর্ষণকালে হলরেখা হইতে আলোকসামান্যা রূপবতী কন্যা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নাম রাখেন সীতা। যথাকালে অযোধ্যার রাজপুত্র দশরথাত্মজ রামচন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দেন। জনক ব্রহ্মবাদী রাজা ছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞানী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি দেশ-বিদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য দূর-দূরান্তর হইতে বহু জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য আসিতেন। প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন রাজর্ষি।

শুকদেব ঃ—

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের পুত্র। পুত্রকামনায় ব্যাসদেব সুমেরু পর্বতে

মহাদেবের তপস্যা করেন। শতবর্ষ তপস্যা করিবার পর মহাদেব ব্যাসদেবকে বরদান করেন। ব্যাসদেব পুত্র কামনায় যজ্ঞ করিলে যজ্ঞের অগ্নি হইতে শুকদেব জন্মগ্রহণ করেন। শুকদেব পিতার নিকট মোক্ষধর্ম, দেবগুরু বৃহস্পতির নিকট বেদাদি ধর্মশাস্ত্র এবং রাজর্ষি জনকের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা অধ্যয়ন করেন। তিনি এমন জিতেন্দ্রিয় ছিলেন যে, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ তাহার ধ্যান ভাঙাইতে পারে নাই।

নাগার্জুন ঃ—

বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক। বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখার মাধ্যমিক মার্গের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নাগার্জুন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে বিদর্ভদেশে আবির্ভূত হন। অন্ধ্ররাজ সাতবাহনের সহিত তাঁহার মিত্রতা ছিল। ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পর ইনি নিষ্ঠার সহিত দাক্ষিণাত্যে বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন। দর্শন ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র এমনকি জাদুবিদ্যাতেও তিনি অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। 'মাধ্যমিক কারিকা' নামক দর্শনের গ্রন্থ লিখিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হন। এই গ্রন্থের 'অকুতোভয়' নামে একটি টীকাও তিনি রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি 'যুক্তিযষ্টিকা' ও 'শূন্যতা সপ্ততি' নামে দুইটি দার্শনিক গ্রন্থ লেখেন। বন্ধু রাজা সাতবাহনকে উপদেশ দিবার জন্য তিনি 'সুহৃল্লেখ' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। চীনা পরিব্রাজক ঈ-ৎ-সিঙ এই গ্রন্থটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এছাড়াও তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন—প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্রশাস্ত্র, দশভূমিবিভাগ শাস্ত্র, বিগ্রহব্যবর্তনী, মহাযানবিংশক প্রভৃতি। এই সকল গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তাঁহার দার্শনিক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।

নাগার্জুন ছিলেন শূন্যবাদের প্রবক্তা। তাঁহার মতে, অস্তি, নাস্তি, নিত্য, অনিত্য, আত্মা, অনাত্মা প্রভৃতি কোনো অন্তিম শব্দকেই সত্য বলা যায় না। অন্ততঃ বুদ্ধ-বাণীর তাৎপর্য তাহাই। এইমত স্থাপন করিতে গিয়া ইনি ন্যায়শাস্ত্রের বিচারধারা অবলম্বন করেন।

বুদ্ধ ঘোষ ঃ—

বিখ্যাত পালিভাষাবিদ ও সাহিত্যিক এবং বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। বৈদিক সাহিত্যে সায়ণাচার্যের যে স্থান, পালি সাহিত্যে সেই স্থানের অধিকারী বুদ্ধ ঘোষ। অসাধারণ মেধা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী বুদ্ধ ঘোষ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে মগধ দেশে বোধিবৃক্ষের নিকটবর্তী কোনো এক গ্রামে পণ্ডিতব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণশাস্ত্রে পারদর্শিতা অর্জনের পর 'রেবত' নামে এক শ্রমণের নিকট বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নেন। সিংহলরাজ মহানামের রাজত্বকালে তিনি সিংহলে বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠের জন্য গমন করেন এবং সেখানে অনুরাধাপুরে বিখ্যাত মহাবিহারে বিশেষ যত্নসহকারে ত্রিপিটক ও অট্‌ঠকথাসমূহ অধ্যয়ন করেন। তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিশুদ্ধমুগ্‌গ্'-তে বৌদ্ধ শিক্ষার মূল সূত্রগুলির সারগর্ভ এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি সমগ্র বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের টীকা রচনা করেন। ত্রিপিটক হইতে জাতক সকল গ্রন্থের উপর তাহার রচিত টীকা রহিয়াছে। পালিভাষা, বৌদ্ধশাস্ত্র ও দর্শন ব্যতীত জ্যোতির্বিদ্যা, ব্যাকরণ, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়েও তাঁহার অপরিসীম জ্ঞান ছিল।

কল্কি অবতার ঃ—

ভগবান বিষ্ণুর দশম বা শেষ অবতার কল্কি। কলিযুগের শেষে বিষ্ণু কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া কলিকে বিনাশ করিলে পুনরায় সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। ভগবান বিষ্ণু শম্ভল গ্রাম নিবাসী বিষ্ণুযশা নামক পূতচরিত্র ধার্মিক এক ব্রাহ্মণের গৃহে কল্কি নামে জন্মগ্রহণ করিবেন। কলির শেষভাগে পৃথিবী ম্লেচ্ছপূর্ণ ও পাপে পরিপূর্ণ হইবে। শ্রীবিষ্ণু দুই পক্ষযুক্ত শ্বেত অশ্বে আরোহণ করিয়া একহস্তে তরবারি ও অন্যহস্তে চক্র লইয়া ম্লেচ্ছ নিধন করিবেন এবং ধর্মসংস্থাপন করিবেন।

মৎস্য অবতার ঃ—

শ্রীবিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে প্রথম অবতার মৎস্য। ভগবান মনু স্নানান্তে

তর্পণ করিতেছিলেন। একটি ক্ষুদ্র মৎস্য এক বৃহৎ মৎস্যের ভয়ে ভীত হইয়া মনুর জলপূর্ণ অঞ্জলিতে আশ্রয় লইল। মনু তাহাকে পুষ্করিণী, নদী প্রভৃতি জলাশয়ে রাখিলেন। কিন্তু প্রতিদিন সে এত বাড়িতে লাগিল যে, শেষ পর্যন্ত তাহাকে লইয়া মনু সমুদ্রে ফেলিয়া দিলেন। সমুদ্রে পড়িয়া সে মনুকে আসন্ন প্রলয়ের সংবাদ দিয়া বৃহৎ একটি নৌকায় জীবজন্তু ও বেদাদিধর্মশাস্ত্র সমূহ লইয়া অবস্থান করিতে বলিল। মনু মৎস্যের কথা অনুসারে তাহাই করিলেন। কয়েকদিন পরেই প্রলয় শুরু হইল। সমস্ত পৃথিবী জনমগ্ন হইল। মনু দেখিলেন সেই বৃহৎ মৎস্য আসিয়াছে। তিনি মৎস্যের শৃঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া দিলেন। প্রলয় কালীন জলোচ্ছ্বাসে মৎস্য সেই নৌকা রক্ষা করিল। ধীরে ধীরে জলোচ্ছ্বাস কমিলে, হিমালয়ের শৃঙ্গ দেখা দিলে, মনু সেখানে নৌকা বাঁধিলেন। বেদাদি ধর্মশাস্ত্র ও জীবজগৎ রক্ষা পাইল।

কূর্ম অবতার ঃ—

শ্রী বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে দ্বিতীয় অবতার হইল কূর্ম। সমুদ্র মন্থনকালে ভগবান বিষ্ণু কূর্মরূপ ধারণ করিয়া মন্থনদণ্ড স্বরূপ মহেন্দ্র পর্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন এবং কল্পারম্ভে পৃথিবীকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন।

বরাহ অবতার ঃ—

শ্রীবিষ্ণুর দশ অবতারের তৃতীয় অবতার বরাহ। মহাপ্রলয়কালে পৃথিবী জলমগ্ন হইলে চিন্তান্বিত ব্রহ্মা জগৎ রক্ষার জন্য বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু একটি বরাহ মূর্তি ধারণ করিয়া ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে নির্গত হইয়াই মুহূর্তমধ্যে হস্তীর ন্যায় বৃহৎ হইলেন। সেই বরাহের গর্জনে ত্রিভুবন কম্পিত হইল। ত্রিলোক নিবাসী দেব-দ্বিজ-মুনিঋষিগণ শ্রী বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। তারপর সেই বরাহ জলমধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করেন এবং দন্তাগ্রভাগ দ্বারা পৃথিবীকে ধারণপূর্বক ঊর্ধ্বে উত্থিত করেন। দেবতা, ঋষি, মুনি, সিদ্ধ পুরুষগণ তখন বিষ্ণুর স্তব করেন।

নৃসিংহ অবতার ঃ—

শ্রী বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে চতুর্থ হলেন নৃসিংহ। এই অবতারে ভগবান বিষ্ণু অর্ধনরদেহ ও অর্ধসিংহদেহ ধারণ করিয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। আপন ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকে বধ করিবার জন্য হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন। পুত্র প্রহ্লাদ সেই বিষ্ণুর ভক্ত হওয়ায় তিনি নানাভাবে প্রহ্লাদকে বধ করার চেষ্টা করেন। পরিশেষে ব্যর্থ হইয়া একদিন রাজসভায় তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বিষ্ণু কোথায় থাকেন? প্রহ্লাদ বলিলেন—'তিনি সর্বত্র বিরাজ করেন।' সম্মুখস্থ একটি স্তম্ভ দেখাইয়া হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সেই স্তম্ভে বিষ্ণু আছেন কি না? প্রহ্লাদ সম্মতি জানাইলে দৈত্যরাজ পদাঘাতে স্তম্ভ ভাঙিবা মাত্র ভগবান বিষ্ণু নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন।

বামন অবতার ঃ—

শ্রী বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার বামন। প্রহ্লাদের পৌত্র বলি দেবতাদের স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিলে তাঁহারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু বলিকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে কশ্যপ মুনির ঔরসে অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বলি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দান করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষ্ণু 'বামন' অবতারে তাঁহার নিকট ত্রিপাদ ভূমি মাত্র চাহিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য এই দান দিতে বলিকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু অঙ্গীকারবদ্ধ বলি শুক্রাচার্যের কথা অমান্য করিয়াই বামনকে ত্রিপাদ ভূমি দিতে স্বীকৃত হইলেন। বামন প্রথম পদে সমস্ত স্বর্গলোক, দ্বিতীয় পদে মর্ত্যলোক এবং তৃতীয়পদে পাতাল লোক অধিকার করিলেন। বিষ্ণু বলির সত্যবাদিত্যর জন্য সাবর্ণি মন্বন্তরে বলি ইন্দ্রত্ব লাভ করিবে বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন। বলি পাতালে গিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন।

শঙ্করাচার্য ঃ—

অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা শঙ্করাচার্য ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরলের কালাডি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্পবয়সে সন্ন্যাসী হইয়া নর্মদা তীরে গোবিন্দপাদের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শঙ্করাচার্য ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

দার্শনিক। ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতির ভাষ্য রচনা করিয়া এবং 'বিবেকচূড়ামণি' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া তিনি অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবন হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্যে তিনি ভারতের চারিপ্রান্তে চারিটি মঠ স্থাপন করেন; উত্তরে জ্যোতির্মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরিমঠ, পূর্বে গোবর্ধন মঠ, পশ্চিমে সারদা মঠ। এই চারিমঠের অধ্যক্ষগণ আজিও শঙ্করাচার্য বলিয়া পূজিত হন।

তাঁহার প্রচারিত অদ্বৈতাবাদের মূলকথা হইল—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম কিন্তু অজ্ঞানবশতঃ স্বরূপ বিস্মৃত হয়। জ্ঞানের উদয় হইলে আত্মস্বরূপ প্রকাশে বাধা থাকে না। এই অবস্থার নাম মোক্ষ (মুক্তি)। জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়।

পোড়া ক্রুশ ঃ—

স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলে পোড়া কাঠের ক্রুশ যুদ্ধের ডাক হিসাবে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে পাঠানো হইত। এই পোড়া ক্রুশ পাইয়া গোষ্ঠীপতিগণ বুঝিতে পারিতেন ধর্মযুদ্ধের জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে।

আপরিতোষাদ্ ঃ—

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের মুখে উক্তিটি শোনা যায়। উক্তিটি হইল—

'আ-পরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।
বলবদপি শিক্ষিতানামাত্মন্য প্রত্যয়ং চেতঃ।।

অর্থাৎ—যতক্ষণ পর্যন্ত পণ্ডিতবর্গের তুষ্টিবিধান না হয়, ততক্ষণ অভিনয় নৈপুণ্য যথাযথ হইয়াছে বলিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কারণ যথেষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিদেরও মন আপন যোগ্যতা বিষয়ে নিঃসংশয় হয় না।

*****